Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইকবালের কবিতায় মানুষ ও মানবতা

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাফর আহমদ ভূইয়া
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.3
Pages	46-57
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ইকবালের কবিতায় মানুষ

Check for updates

জাফর আহমদ ভূইয়া*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) পরাধীন ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী দুই মনীষী, যাঁরা নিজেদের প্রাজ্ঞ মনীষায় ভারতীয় উপমহাদেশের মর্যাদা ও গৌরব বিশ্বের দরবারে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইকবাল দার্শনিক কবি, জীবনের কবি এবং মানবতার কবি। তাঁর লেখনী উৎসর্গিত হয়েছিল মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে।

ইকবাল প্রধানত শক্তির কবি ; তিনি সমাজ-সংস্কার স্বাধীনতা অর্জনে শক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে। কোথাও কোথাও তাঁর ভাবপ্রবণ মানসিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও, বিপ্লবের বাণীও শুনিয়েছিলেন। তাঁর 'ইনকিলাব' শীর্ষক কবিতাটি তার উপযুক্ত চিন্তাধারার সাক্ষ্য বহন করে।

ইকবাল নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত, সমাজের মানুষকে মানবতার কথা ও দুঃখ দুর্দশা অতিক্রমের বাণী শুনিয়েছিলেন।

ইকবাল ছিলেন চিরন্তনত্বে বিশ্বাসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ের কবি। এ বিশ্বলোক, স্রষ্টা, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। কবি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এতদ্‌ বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট থাকলেও ক্রমশ তা বিকশিত হয়েছে এবং বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে।

তিনি ছিলেন সংগ্রামী কবি। তাঁর দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ছিল সংকীর্ণতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। সামগ্রিকভাবে তাঁর সংগ্রাম ছিল পাশ্চাত্যের ধর্মহীন সভ্যতা-সংস্কৃতির, সর্বোপরি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, বস্তুবাদের বিরুদ্ধে।

বস্তুত আল্লামা ইকবালের দার্শনিক মত ও দৃষ্টিভঙ্গি এটাই। তাঁর ধারণা, ইসলামি মানবতাবোধই দেশকাল, ধর্ম ও বর্ণের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন রূপ লাভ করতে পেরেছে। আর পাশ্চাত্যের আদর্শবোধই মানবকুলের মধ্যে ভিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও রক্তপাতের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

---

* প্রভাষক, উর্দু ও ফারসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইকবাল মনে করতেন পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদে সুরক্ষিত রয়েছে বস্তুবাদের বীজ। নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পৃক্ত জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতার অভিন্নতা বোধ একান্তই অপরিহার্য্য।

ইকবাল তাঁর জীবনের প্রারম্ভে পারস্যের সুফিবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। এই প্রভাবের প্রতিফলন ঘটে তাঁর কাব্যে। এই পর্যায়ে তাঁর মধ্যে ভাববাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি ভাববাদ থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে থাকেন এবং বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেন। মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে তিনি আরও বেশি বাস্তববাদী হন। বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী অন্যায় শোষণ থেকে মুক্তি সংগ্রামের চেতনা মার্কস ও মার্কসবাদ থেকেই পেয়েছে। তাঁর 'লেলিন' কবিতায় এর প্রতিফলন ঘটেছে। কবির জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর মানবতাবোধ সমাজের নিম্নস্তরের নির্যাতিত আপামর মানুষের জন্য উৎসর্গিত হয়। তাঁর কাব্যে, দর্শনে এবং সাহিত্যে এইসব নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর যে দরদ এবং তাদের মুক্তির জন্য তাঁর যে উদ্যোগ, তা সুস্পষ্ট। এই পর্যায়ে তাঁর মানবতাবোধকে বিশ্বজনীন গণ-মানবতাবোধ বলা যেতে পারে। মার্কসবাদের নিঃস্ববাদকে বাদ দিয়ে, বিশ্বজনীন সর্বহারার মানবতাবাদকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

১.

ইকবালের কাছে ধর্ম দর্শনের যে মানদণ্ড তা সাধারণ জীবনদর্শনেরই একটি অংশ। তাঁর দর্শনের বিষয়বস্তু হচ্ছে : ইনসান বা মানুষ। মানুষের মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ বিধানই তাঁর লক্ষ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে মুমিনের দু'টি বৈশিষ্ট্য একটি তার মানবীয় সত্তা, অন্যটি ইমানি সত্তা ; মানবিক সত্তা হিসাবে সে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার জন্ম ও সাধারণ মানুষের জন্মের মতই, দৈহিক গঠন ও বর্ধনও অন্যান্যের মত। আবেগ অনুভূতিও সাধারণ মানুষের থেকে খুববেশি ব্যতিক্রমী নয়, বরং একই রকম। কৃষিকার্য ও ব্যবসায়ের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট আগ্রহ, সন্তান ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের প্রতি তার রয়েছে স্নেহ ভালবাসা। সাধারণ ভাবে মানবিক সত্তার বিচারে সে অন্যান্য মানুষের মতই প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধানের অধীন। কিন্তু একজন মুমিন ব্যক্তির সমগ্র জীবন যদি সাধারণ মানুষের মতই কেটে যায়, তাহলে বিশ্বলোকে তার কোন ব্যতিক্রমী বিশেষত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইকবালের ঈমানি সত্তা অবশ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতরাং এ বিচারে তাঁর কাছে রয়েছে বিশ্বমানবতার প্রতি একটা মহা পয়গাম যে পয়গাম মূলত নবী রাসুলগণেরই প্রচারিত পয়গাম। তার জীবন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নিবেদিত। তিনি তাঁর নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বস্ত ও আস্থাবান ছিলেন।

বিশ্ব পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবালের নিঃসন্দেহ অভিমত ; সুষ্ঠু ও শুভ পরিণতি সম্পন্ন বিপ্লব কেবল মর্দে মুমিনের কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করে। আর এ সকল বিপ্লবের ফল হিসেবে নির্মিত হয় একটি জগত।

ইকবালের ধারণা, দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই বর্তমানে যে ইবলিসি অর্থাৎ শয়তানি রাজত্ব ও শাসন প্রবর্তিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, মর্দে মুমিনগণ এখনও পুরোমাত্রায় সংগঠিত হতে ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। যেদিন তাদের আবির্ভাব ঘটবে, আর তাদের বুকে লুক্কায়িত বাসনার অগ্নি-স্ফুলিংগ জ্বলে উঠবে, সেদিনই ইবলিসের প্রভুত্ব ও রাজত্ব, শাসন পানির উপর অংকিত নক্‌শার মত মিলিয়ে যাবে।

ইকবালের বিশ্বদর্শনই হচ্ছে 'ইকবাল-দর্শনে'র প্রকৃত স্বরূপ, যা বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি শুনিয়েছেন মানবতার প্রতি দরদ ও ভালোবাসার বাণী, মানুষের স্বাধীনতার বাণী। তাঁর তেজোদীপ্ত আত্মার অনির্বাণ অনুভূতিসমূহ যেন শতসূর্যের মত জ্বলছে। আর বিশ্বমানবতাকে, বিশেষ করে মুসলমানকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে। ইকবাল বলেন :

আমরা তুর্কী নই, আফগানী নই, তাতার নই,
এ-শ্যামল সবুজ মাঠেই আমাদের জন্ম
আমরা শাখা-প্রশাখা থেকে সৃষ্ট।
আমাদের পক্ষে রং ও ঘ্রাণের পার্থক্যকরণ অবৈধ।
কেননা আমরা একই শাখা-প্রশাখা থেকে
প্রতিপালিত হয়ে এসেছি।[১]

২

ইকবালের দৃষ্টিতে, মানবিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই কেবল সামাজিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। আর এভাবেই সৃষ্টির উন্নতি এবং যথাযথ বিকাশ সম্ভব। সমস্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বিষয়টি মানুষ এবং তার উপলব্ধি থেকেই উৎসারিত।

ইকবাল সচেতন, স্বাধীন, চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হিসেবে মানুষের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের সভ্যতার প্রতি আসক্তিই এদেশীয় মানুষের সর্বনাশের কারণ। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকরণগুলোকে বস্তুবাদী এবং তার প্রকৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে আখ্যাত করেছেন। ইকবাল বলেন, "পাশ্চাত্যের

---

১. আল্লামা ইকবাল, *যরবে কলীম*, ১৯৩৬, পৃ. ১৯

যাঁতাকলে (পিষ্ট হয়ে) মানবতা ক্রন্দন করছে, পাশ্চাত্যের অভিশাপে মানবজীবন বিপর্যস্ত।" তাঁর প্রশ্ন, হে প্রাচ্যের জাতিসমূহ, তোমরা কি জান আজ আমাদের করণীয় কি? প্রাচ্যের দিনগুলো পুনরায় আলোকিত হচ্ছে, (প্রাচ্যের) হৃদয়ে বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছে, রাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সূর্য-উদ্ভাসিত হয়েছে। তার (পাশ্চাত্যের) কারণেই মানুষের যাবতীয় সমস্যা, তার কারণেই মানবতার যত ভোগান্তি।

ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, ইসলামি-প্রাচ্য তার প্রকৃত সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাকে অবশ্যই হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে হবে। ইকবল বলেন যে, তাদের পূর্বতন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্য একমাত্র ইমান ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত পথেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইকবাল বলেন :

হে ঘুমন্ত পুষ্পকলি! নার্গিসের মতো জেগে ওঠো,
আমাদের আবাসগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে,
পরিতাপ নিয়ে জেগে উঠো,
বাগানের বুলবুলের ক্রন্দন এবং আযানের সুমধুর
ধ্বনিতে জেগে উঠো।[২]

এ ক্ষেত্রে 'দার্শনিক ইকবাল' ও 'কবি ইকবাল'-এর ভূমিকাকে সমন্বিত করে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস গ্রহণ করা যায়। উল্লেখ্য তাঁর দর্শন পরিব্যাপ্ত হয়েছে কবিতায় এবং কবিতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে দার্শনিক অভিব্যক্তিতে। তিনি মানবজীবন, সমাজ, পৃথিবী এবং পার্থিব জগতের বাইরে অপার্থিব জগতের ব্যাখ্যা করেন বাস্তবতার নিরিখে। রোমান্টিক আবেগে প্রবহমান চলিষ্ণুতায় জীবন ও জীবনাধারায় এ পৃথিবীকে ফেলে দিয়ে অসীমের সঙ্গে মিলতে চান, লীন হতে চান। এভাবেই তিনি একজন সম্পূর্ণ কবি হয়ে ওঠেন।

ইকবালের জীবন-দর্শন ধর্মের মধ্যে প্রোথিত, ইসলামের মৌলিকতা থেকে উৎসারিত। মূলত তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্ম এগুলিকে অর্থনীতি-রাজনীতির কেন্দ্রীভূত রূপে দর্শন করেছেন ; তারই মধ্যে তিনি মানবসত্তা ও জীবনের মুক্তির সন্ধান করেছেন :

কাব্য সংগীত ও রাজনীতি বিদ্যা ধর্ম ও শিল্প
গ্রথিত সবাই তারা একটি মোতির মালায়

২. ঐ. পৃ. ২১৩

মাটির মানুষের অন্তরে তাদের প্রকাশ
অকাশ ছাড়িয়ে গেছে সিতারার জাহান।
খুদীর সংরক্ষণ জীবনের স্রোতস্বিনী যেন
অন্যথায় মৃত্যুর শীতলতা তথা নিষ্করুণ কাহিনী
জাতিগুলি লাঞ্ছিত সেদিন আকাশের গভীর প্রচ্ছায়
ধর্ম ও সাহিত্য যেদিন বিচ্ছিন্ন হলো খুদী থেকে।[৩]

প্রকৃতির উপর মানবীয় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে অধিকতর সুন্দর করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন আল্লামা ইকবাল। শুধু তাই নয়, তিনি মানবসৃষ্ট রাজনৈতিক জগতের পুরানো নকশা মুছে ফেলে, একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়া জাহান সৃষ্টিরও আওয়াজ তুলেছেন। সমাজ ও সমকাল-সতেচন ইকবালের জীবন ও প্রতিবেশ ছিল পাপে-তাপে শোকে-দুঃখে জর্জরিত। তিনি সে সমাজের সাধারণ মানুষকে পুঁজিবাদীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত হতে দেখেছেন। এমনকি গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্রের স্টিম রোলারের নিষ্পেষণও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। পাশ্চাত্য জগত প্রাচ্য জগতকে গ্রাস করার জন্য যেসব প্রকার পাশ্চাত্য কূটকৌশল ক্রিয়াশীল, তা তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম দেয়াল খাড়া করে মানবগোষ্ঠীকে নানাভাবে বিভক্ত করার অপপ্রয়াস এবং বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর অগনিত নিরীহ মানুষকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা। ইকবাল ছিলেন একজন মানবদরদী কবি। তিনি নিজেও অত্যাচারিত, দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দৈন্য দেখে জালিমদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নিরীহ মানুষের শ্রমে ও অর্থে গড়া ধনীর রাজকীয় প্রাসাদ চুরমার করে দেয়ার বজ্র-সংকল্প ঘোষিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। পৃথিবীর পুরানো রাজনৈতিক অবকাঠামো ভেঙে ফেলে সত্যিকার কল্যাণধর্মী সরকার গঠনই তাঁর অন্তরের দাবি। তাঁর অভিমত। নিজে জমি চাষ করেও কৃষক যদি ফল ভোগ করতে না পারে, তবে ঐ ক্ষেতের সমস্ত ফসল পুড়িয়ে ফেলাই শ্রেয়। ইকবাল বলেছেন :

উঠ্‌ঠো মেরী দুন্‌য়াকে গরীবুঁকো জাগা দো
কাখ-এ উমরাকে দরও দীওয়ার হেলা দো।[৪]

অর্থাৎ : তোমরা উঠো এবং আমার পৃথিবীর গরিবদের জাগিয়ে দাও। আমির

---

৩. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *ইকবালের কবিতা : ফররুখ রচনাবলী* (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ২৪৬

৪. আল্লামা ইকবাল, 'প্রার্থনা', *বালে জিবরীল*, ১৯৩৫, পৃ. ১২৩

ওমরাদের প্রাসাদ উপড়ে ফেল।

ইকবালের কাব্যের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে মানুষ। মানুষের ভেতর তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও মানবতার স্ফূরণ দেখেছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানবিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের যোগ্যতার মধ্য দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা। আর আল্লাহর প্রতি নিজেকে চূড়ান্ত নিবেদনের মধ্যেই জীবনের পরিপূর্ণতা ও মহামুক্তি। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিত্ববাদের কথাও যেমন এসেছে, তেমনি ব্যক্তিত্বের সৃজনশীল বিকাশের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বপালকের প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এবং মানবীয় কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অনুশীলন, এই হলো ইকবালের মানব বিষয়ক চিন্তা :

তুমি হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে
কোরো না অস্বীকার ;
না হলে পাবে না লাভ করতে সে স্বর্গপুর
যেখানে আল্লাহর নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চলো,
হে অমনোযোগী আত্মা।
বাধ্যতার পরিণামই স্বাধীনতা।
অলস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ে ওঠে কর্মী
এই আইনের বিধান মেনে
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের
আগুন হয়ে যায় ছাই।[৬]

মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অসীম ; এই অমোঘ সত্য তাঁর কবিতার উপলব্ধিতে জাগরুক :

তোমার খুদায়ীর কাছে প্রমত্ত মনের সম এই অভিযোগ
তুমি ব্যাপ্ত অসীমে, আমি বন্দী সীমার বাঁধনে।[৭]

মাটির পৃথিবীতে মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর কর্ষণই তার কর্ম-কর্তব্য, এখানেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ। মৃত্তিকা নির্যাসে মানবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ

---

৬. 'কণিকা', ঐ, পৃ. ১৫৯

৭. 'তাওহিদ-তত্ত্ব', *যবূরে কলীম*, পৃ. ১৮

সাধন মহত্তম শিল্পকর্ম। এজন্যই পৃথিবীর আত্মা আদি মানব আদমের প্রতি অভিনন্দন জানায় এ ভাষায় :

প্রজ্ঞার বারিধি মানিবে না কোন দিন কোন সীমারেখা,
নভের উচ্চতা ছুঁয়ে চিত্তের স্ফুলিঙ্গ তব দূরে দে রে দেখা।
গড়ে তোল নিজ সত্তা আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে
তারপর দেখ যেয়ে একা।
যে সূর্যে প্রদীপ্ত বিশ্ব সে তোমার স্ফুলিঙ্গ দহন ;
তোমার শিল্পের মাঝে সম্মোহিত আছে এক সম্পূর্ণ পৃথিবী নতুন।[৮]

মানুষের ব্যক্তিক বিকাশের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন কবি ইকবাল, তাকে আবার সমন্বিত করেছেন সমাজচেতনার সঙ্গে :

ব্যক্তি ও সমাজ যদি যুক্ত হয় খুলে যায় রহমতের দ্বার,
সমাজ সান্নিধ্যে পায় ব্যক্তির মানস চির মূল্য পূর্ণতার,
সমাজের সাথে রাখো সখ্যতা সংগ্রামী হও, হও মুক্তপ্রাণ,
মহান নবীর কথা মনে রেখো : দলত্যাগী সে যে শয়তান।[৯]

ইকবালের রচনাকর্ম পাঠ করে মানুষ ও মানবতাকে আবিষ্কার করতে হলে, তাঁর ধর্ম-চিন্তার অনুধাবন অপরিহার্য। তিনি ইসলামকে শুধু আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব সাধারণ ধর্মের মত করে দেখেননি। ইসলামকে গ্রহণ করেছেন পরিপূর্ণ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে। কারণ সে ধর্মই পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সামগ্রিক জীবনকে। আর জীবনচর্চার ভেতর দিয়েই বিকশিত হয় মানবিকতাবোধ। ইকবালের দৃষ্টিতে ধর্মের সংজ্ঞা হলো :

ধর্ম কি জানো?
মৃত্তিকা থেকে উত্থান।
যেন এ আত্মা খুঁজে পায় তার সত্তার সন্ধান।[১০]

ধর্ম-বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে ইকবাল বলেছেন :

যে দিন বিচ্ছিন্ন হল ধর্ম আর রাষ্ট্র একে একে ;

---

৮. আল্লামা ইকবাল, *বাঙে দারা*, ১৯২৪, পৃ. ১২০
৯. 'একটি প্রশ্ন', *যরবে কলীম*, পৃ. ৯০
১০. 'ওয়াৎনিয়াৎ', *বাঙে দারা*; পৃ. ৯০

লালসার আধিপত্য দেখা দিল সেই দিন থেকে।
বাদশাহী বিক্রম আর পরিহাস এ গণতন্ত্রের,
বিচ্ছিন্ন যখন ধর্ম রাজনীতি থেকে
অবশিষ্ট থাকে শুধু নীতি চেঙ্গিসের।[১১]

ইসলামের মূলসূত্র নিহিত তওহিদে ; ইকবাল 'তওহিদ তত্ত্বে' মানুষের পৌরুষের বিকাশ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন :

কথায় প্রকাশ করা যায় তওহিদের গভীর তত্ত্ব
কিন্তু তোমার মগজে থাকে যদি মূর্তি মন্দির
তাহলে বলার কিছু নেই।...
পৃথিবীতে আজাদ বান্দার দেখা আছে বহু
কিন্তু গোলামির দৃষ্টি যদি লাভ করো তুমি
তা হলে বলার কিছু নেই।
ফকিরি বুলন্দ কতো বাদশাহী থেকে
কিন্তু কারোর প্রকৃতি যদি ভিক্ষাবৃত্তি হয়
তা হলে বলার কিছু নেই।[১২]

৩.

ইকবালের মানবতাবাদে অভিষিক্ত একজন পরিপূর্ণ মানুষ তিনি অসীমের মধ্যে লীন হতে পারেন আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে। তাঁর স্বাধীনতা কোন ভূখণ্ডগত সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়। এ জন্যই তিনি কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক মানুষ :

স্বদেশ মাঝে বন্দী হলে মরবে তুমি সে নির্ঘাত
নীল দরিয়ায় থাকবে তুমি মাছের মতন নীল আযাদ।
এক জাতি যে আরেক জাতির দুশমন, তার মূলতো এই,
দেশ-বিজয়ের নেশাও আসে এ স্বদেশের প্রেম থেকেই।
রাষ্ট্র থেকে ধর্ম যে আজ পৃথক তার তো এই কারণ
এতেই করে সবলরা ভাই দুর্বলদের আক্রমণ।

---

১১. ইউরোপীয় সভ্যতা, *বাঙে দারা*, পৃ. ৮৩
১২. 'মদনিয়াৎ-ই-ইসলাম', ঐ. পৃ. ১০৯

ওয়াৎনিয়াতের তরেই আজি খণ্ডিত সব মানবজাতি
দীন ইসলামের কওমিয়াতের জড় কেটে দেয় ওয়াৎনিয়াৎ।[১৩]

ইকবালের রচনার উপস্থাপিত মানুষ নিরন্তর চলিষ্ণু বেগবান, সত্যানুসন্ধানী ও সৃজনশীল। সংগ্রাম ও জেহাদেই তাদের অপরূপ বিকাশ।

শুনবে কি ভাই মুসলমানের জিন্দিগী সে কেমন রূপ?
সংগ্রাম আর উন্মাদনার রূপ সে অপরূপ।
সূর্য তাহার এক আকাশে হয়ত ডুবে যায়
আরেক আকাশ রাঙা ক'রে ফের সে হেসে চায়।[১৩]

প্রেমের অমর রাজ্য, হে পুত্র আমার বাঁধো ঘর।
নতুন সকাল আনো নয়া সন্ধ্যার খবর,
নতুন জমানা আনো, প্রকৃতিরে বোঝো বোঝো হায়
যদিও পাও, যদি খোদা কৃপা করে তোমার উপর
ফুলের স্তব্ধতা থেকে পয়দা করো তোমার কালাম।[১৪]

কি হবে ফাঁকা শাহানশাহী এ-শান শওকত
বাহুতে যদি না থাকে কারো আলীর হিম্মত!
যদি না পারো দুনিয়াটিকে সুলেমানের মতো
দু'পায়ে ঠেলে ফেলতে তবে দেমাগ কেনো অতো।[১৫]

ইকবাল মানব হিসেবে নিজস্ব পরিচয়কে আরোও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন এভাবে :

তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার ; তাই দিয়ে রচলাম পানপাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য

---

১৩. 'কোন যুবকের প্রতি', ঐ, পৃ. ৬৭
১৩. ঐ, পৃ. ৬৭
১৪. 'জিহাদ', *যরবে কলীম*, পৃ. ২২
১৫. 'মানব', ঐ. পৃ. ৫৪

আমার হ'ল তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ ফুলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'কে করে দেয় আয়না ;
বিষ হ্যতে যে বানায় মধু।[১৬]

ইকবালের সমকালীন বিশ্ব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত। এর প্রতিবাদেই সমাজতন্ত্রের উত্থান ঘটেছে, লেলিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা, শুরু হয়েছে নতুন করে পৃথিবীব্যাপী।

ইকবাল ভাববাদের মোহে আবিষ্ট হয়ে মানুষের বিচার করেননি। রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে মানুষকে দেখেছেন। তাঁর কবিতায় শ্রমজীবী কিষাণ, মজুর নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে কলরব করে উঠেছে। কবি ইকবাল পরম মমতায় এসব শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ছবি এঁকেছেন তাঁর বিশ্বাসের ভূমিতে। ইকবাল বলেছেন :

কৃষকের পক্ষে দুপুরের আগুন কষ্টের সময়
ঘাম থেকেই প্রচণ্ড সূর্যের প্রভাব প্রকটিত
কিন্তু চেহারার উপর আশার ঝলকে খেলতে দেখা যায়
যখন সে পরিশ্রমের ফল সংগ্রহ করে।
'ইয়া মোহাম্মদ' বলে সে নিজের কাজ থেকে উঠে পড়ে
আঃ ! তোমার নামে সে কী শান্তিই না পায়?[১৭]

অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রেণী-শোষণ, পুঁজিবাদের দাপটে কবি ইকবাল বিচলিত হয়েছেন, এসবের বিরুদ্ধে তিনি মানবতার অমোঘ শক্তিকে জাগানোর স্বপ্ন দেখেছেন।

কলকারখানা মালিক কাজের নয়।
আয়েশ-পুতুল, শ্রম করা নাহি চায়।
কোরান বলিছে, খেটে খাও সবে নিজে।
কেন মজুরের শ্রমফল ধনী খায়?...
বদলে তৃষ্ণা সহি সারা নিশীথের।
আর এ জমির মালিক মুখেতে দেখ
সকল রক্ত খেয়ে গেল কিষাণের।

---

১৬. 'পুঁজি ও শ্রম', ঐ. পৃ. ৫৭

১৭. 'আদমের প্রতি পৃথিবীর অভিনন্দন', ঐ. পৃ. ১৭৮

ধনীরা ত সব মত্ত মাতাল শরাব পিয়ে সে শ্বাপদের
গরিব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের।

কপট পাশার চালে পুঁজিপতি জিতিয়াছে বাজি,
সারল্য করেছে তোমা, হে মজুর, সর্বস্বান্ত আজি।
দাঁড়াও, জীবন-বীণা সুরে আজ নতুন ব্যঞ্জনা
হয়েছে পশ্চিমে পূর্বে তোমারই যুগের সূচনা।

শক্তিধর বিচারক তুমি কিন্তু তব পৃথ্বী 'পরে
পরাধীন মজুরের দিন বহু তিক্ততায় ভরা।
মূলধন সৃজনের এই তরী ডুবিবে বা কবে,
প্রতিক্ষণে এ দুনিয়া আছে বসি এ প্রতীক্ষা পরে।[১৮]

ইকবালের উপরিউল্লিখিত কবিতা পড়ে কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রী। এর এই সূত্রেই সমাজতন্ত্রীরাও তাঁকে তাঁদের দলভুক্ত করার চেষ্টাও চালিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে ইকবালের বক্তব্য সুস্পষ্ট :

> বলশেভিক ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, আমার কাছে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবারই নামান্তর। এজন্য ওইসব অপবাদের প্রতিবাদ করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি মুসলমান। তাই উপরি-উক্ত বিষয়ে আমার যে বিশ্বাস তা যে দলিল-প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তাহলো আল কোরআন। অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র উত্তম সমাধান 'আল-কোরআন'-এ উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরণের মন্তব্য অমূলক নয় যে, পুঁজিবাদের শক্তি যদি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তবে তা বিশ্বের জন্য এক প্রকার অভিশাপ রূপে পরিগণিত হতে বাধ্য। কিন্তু বিশ্বকে ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত করার উপায় এই নয় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অশুভ শক্তিকে বাদ দিতে হবে, যে পন্থাটি বলশেভিকপন্থীরা অবলম্বন করেছিল। কোরআনুল কারীম এই শক্তিকে যথাযথ সীমার মধ্যে সীমিত রাখার জন্য ওয়ারিসী আইন, সুদ হারামকরণ, এবং যাকাত ও সাদকা

---

১৮. 'খোদার সমীপে লেনিন', ঐ. পৃ. ১৪৪

ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে। মানবচারত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এসব পন্থাই গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

ইকবাল মানবজাতিকে নিজেদের প্রাজ্ঞ মনীষায় প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের শিক্ষা দিয়েছেন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে শক্তি আহরণের মাধ্যমে প্রকৃতির অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচনের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়, কোন ব্যক্তি বা জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যও নয়। বরং তা হতে হবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য। 'মর্দে-এ মুমিন' একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্যই দুনিয়ায় তাঁর যাবতীয় কাজ করে থাকেন।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কবি ইকবাল বিশ্বময় যে শোষণ-বঞ্চনা, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আজও সে-অবস্থা সমভাবে বিদ্যমান। তাই কবির বিপ্লবের এ আহ্বান আজও নিখিল বিশ্বের শোষিত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানবতার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কবির বাণী অনাগত দিনেও অশান্ত-লাঞ্ছিত আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক হবে, এ ধারণা করা যায়। এ ধারণা ও প্রত্যয় কবিরও ছিল। তাই কবি অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন :

তাদেরি প্রতীক্ষা করি শতাব্দীর রাত্রি শেষে জেগে ওঠে যারা
মোর অন্তরের বহ্নি নেবে যারা, কত সুখী, কত সুখী তারা।[১৯]

---

১৯. 'আসরারে খুদী' *ফররুক রচনাবলী* (১ম খণ্ড), পৃ. ৭২

ব্রেখটের কবিতায় ব্যক্তিগত শক্তি এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন

মন্ময় জাফর*

ব্রেখটের নাটকের সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। ঢাকার মঞ্চে সদর্পে বেড়িয়েছে ব্রেখটের পাত্রপাত্রীগণ। কিন্তু সে পরিমাণে তাঁর কবিতা সমাদৃত হয়নি তেমন ; যদিও কবিতার সম্ভাবনা ব্রেখটের ক্ষেত্রে প্রচুর। বর্তমান সমালোচকরা অবশ্য ব্রেখটের কবিতাকে পাদপ্রদীপের আলোয় টেনে এনেছেন।[১] বলেছেন কবিতায় ঠিক তেমনই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ব্রেখট, যেমনটি দেখিয়েছেন নাটকে।[২] বর্তমান লেখায় ব্রেখটের কাব্য-মুন্সিয়ানার সপক্ষে যুক্তি আছে এবং যুক্তি আছে ব্রেখটের কবিতা কেন পড়া উচিত। মুখোশের আড়ালের মানুষটি—তার নানা দ্বন্দ্বময় সত্তা এবং এর বহুবিধ রূপ—সব কিছু ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। সেখানে ব্যক্তিগত মন্ময় মানুষটিকে পাই আমরা। ব্রেখটের কবিতার ক্ষেত্রে এইটি সবচেয়ে বড়ো পাওয়া।

ঠিক তা-ই ঘটেছে ব্রেখটের বেলায় যেমনটি ঘটেছিল টি. এস. এলিয়েটের ক্ষেত্রে। এলিয়েটের বিশ্লেষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব কিছুটা হলেও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাঁর সুউচ্চ কাব্য খ্যাতির কাছে। কবি না হলেও বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতেন এলিয়ট।[৩] কিন্তু নিজ কাব্য-খ্যাতির কাছে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য পরাজয় মেনেছে। ব্রেখটের নাটকের দুর্দান্তপনার কাছে ঠিক তেমনিভাবেই হার মেনেছে 'ব্রেখট ঃ একজন কবি' এই সত্তাটি। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

---

* প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *ব্রেশটের কবিতা ও গান,* কলকাতা, ২য় সং, ১৯৮৮, পৃ. ৯

২. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *The Cambridge Companion to Brecht*, Cambridge University Press, 1994, p. 201

৩. Hayward, John, Ed., *T.S. Eliot : Selected Prose,* Penguin Books, Reprinted, 1955, p. 2

ব্রেখট নিজে অবশ্যি তাঁর কাব্য-অর্জন সম্পর্কে মধ্যম মতবাদ পোষণ করতেন।[৪] 'কবিতা আমার কাছে ধনুকের দ্বিতীয় গুণের মতো'—এমনটি তাঁকে বলতে শোনা গেছে বেশ ক'বার।[৫] অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের এমন নিজেকে খাটো-করা নিরুদ্বেগ মন্তব্য প্রদান নতুন নয়। ইংরেজি উপন্যাসে বিবিধ অবদান রেখেছিলেন ই. এম. ফরস্টার তাঁর বিস্ময়কর এবং উচ্চ মার্গীয় উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে। এহেন ফরস্টারকেও তাঁর আশিতম জন্মদিনে বলতে শোনা গেছে, তিনি নাকি নিছক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে লিখেছেন।[৬] আরও একটি উদ্দেশ্য অবশ্যি ছিল তাঁর : যাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতেন ফরস্টার, লেখার মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা আদায়। মোদ্দা কথা, 'আমি নিশ্চিত, একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আমি নই।'[৭] সুধীজন এবং সজ্জন সমালোচকরা অবশ্য পোষণ করেছেন ভিন্ন মত। সেজন্য দেখা গেছে, ফরস্টারের মৃত্যুর পর বিলাতের 'দ্যা টাইমস' পত্রিকার শোক-সংখ্যায় তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক' বলে।[৮] ব্রেখটের কবিতার ক্ষেত্রেও একই মূল্যায়ন যথার্থ।

অবশ্য ফরস্টারের মতো অল্প লিখে (ফরস্টারের উপন্যাস সংখ্যা ছয়)[৯] ক্ষান্তি দেননি ব্রেখট। তিনি লিখেছেন প্রচুর, কিন্তু সেগুলোর স্বল্পই হয়েছে প্রকাশিত, তাঁর জীবদ্দশায়। একটি হিসেব বলছে, যদিও মৃত্যুর পরে প্রায় হাজার খানেক কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় ব্রেখটের 'সংকলিত কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৭), তাঁর জীবিতকালে মাত্র একশ' সত্তরটি কবিতা আলোর মুখ দেখেছিল।[১০] এবং 'সংকলিত কবিতাগুচ্ছ'ই শেষ সংবাদ নয়। এর পরেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে আরো কবিতা। বিশেষত ৬৭'র অব্যবহিত পরে প্রকাশিত *Poems about love* বা 'ভালবাসার কবিতা' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

ব্রেখটের কবিতা, প্রাচুর্যে ও পরিমাণে, তাই আমাদের ভাবায়। কবিতা তাঁর ধনুকের দ্বিতীয় গুণ ছিলো কি না সে দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে মোটামুটি বলা যায়, জার্মানির

---

৪. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১
৫. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *Ibid*, p. 201
৬. Forster, E.M., *A Passage to India*, Penguin Books, Reprinted, 1989, p. 1
৭. *Ibid*
৮. *Ibid*
৯. Ousby, Ian, *The Wordsworth Companion to Literature in English*, Wordsworth, 1994, p. 339
১০. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ব্রেখট এক জন। সে বিষয়ে আজকের সমালোচকেরা পূর্ণ মাত্রায় দ্বিধামুক্ত।

তবে ব্রেখটের সঙ্গে মুলধারার জার্মান কবিতার পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই। গ্যেটে এবং রোম্যান্টিকেরা যে প্রভাব রেখে গেছেন জার্মান কবিতায়, সে ধারাকে অনুসরণ করে এগিয়েছেন রিলকে কিংবা হফম্যানস্‌থ্যালের মত কবিরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ট্যাক্‌ল্‌ এবং বেন।[১১] জার্মান কবিতার বিশ শতকীয় ধারা যাঁরা যুক্ত করেন এই চার কবির সঙ্গে, ব্রেখটের স্থান নিয়ে তাঁদের অস্বস্তি থাকতে পারে।[১২] মূল ধারার বাইরে পড়েন ব্রেখট, কেন না তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর, অনন্য শিল্পকুশলতা সমন্বয়ে যার সৃষ্টি। প্রতিদিনকার শব্দসমূহ, বর্ণনার বিশ্বস্ততা, শক্তিশালী ধারণাপ্রদানকারী ছন্দময়তা ব্রেখটের কবিতাকে একটি অনন্য মাত্রা দান করেছে।

ব্রেখটের সঙ্গে হাইনরিখ হাইনের সাজুয্য তাই অনেকে খোঁজেন। ব্রেখট কিন্তু নিজে এই রকম ছকবিন্যাসের বিপক্ষে ছিলেন। ব্যক্তিগত টানাপোড়েন এবং পরিপার্শ্ব সম্পর্কে স্বীয় উপলব্ধির জগৎটিকেই ব্রেখট ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। রাজনৈতিক কারণসমূহ ব্রেখটকে বাধ্য করেছে ঝঞ্ঝা-ক্রুদ্ধ জীবনযাপনে, এক দেশ হতে অন্য দেশে ক্রমাগত বসতি পরিবর্তনে। ব্রেখট এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, 'যারা পরে জন্মেছে, তাদের উদ্দেশে' কবিতায় ঃ সত বার না পায়ের জুতো বদলেছেন কবি, তার চেয়েও বেশি বদলেছেন আবাসভূমি, দেশ এমনকি কখনো নাগরিকত্ব।[১৩] ভিন্ন দেশে সহজেই প্রবিষ্ট হতে পারেন নি তাদের সংস্কৃতিতে, কখনো হয়েছেন পরিত্যক্ত। ব্রেখটের মধ্যেকার সংবেদনশীল শিল্পীসত্তাটি তাই বারবার পীড়িত হয়েছে। ব্রেখটের কবিতা বৈশিষ্ট্যময়, কেননা পীড়িত সত্তার নানা রূপ মাত্রা পেয়েছে সেখানে।

ব্রেখটের ব্যক্তিগত সত্তার সন্ধান তাই মেলে তাঁর কবিতায়। যদিও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রধানত এক রাজনৈতিক নাট্যকার, কবিতা ছিল বরাবর তাঁর আত্ম-প্রকাশের বাহন। তবে প্রথাবদ্ধ লিরিক কবিতায় যেমন কেবল নিছক আত্মমগ্নতা পরিলক্ষিত হয়, ব্রেখটের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। নাট্যকার তিনি। কিন্তু কবিতায়ও সত্তাকে প্রক্ষেপণের একটি প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য তাঁর মধ্যে। আর প্রয়াস

---

১১. Bradbury, Malcolm and Mcfurlane, James, Ed. *Modernism : A Guide to European Literature : 1890-1930*, Penguin Books, 1991, p. 383

১২. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *Ibid*, p. 201

১৩. Willet, J & Manheim, R, Trans. & Ed., *Poems 1913-1956*, Bertold Brecht, methuen, London & Newyork, 1987, p. 318, স্ব-কৃত অনুবাদ।

আছে তাঁর মধ্যে ভাষার বাহুল্য বর্জন করে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের। আর তাই, 'এই লিরিকগুলো আমি রান্নাঘরেও পড়তে পারি'—ম্যাক্স ফ্রীশ মন্তব্য করেছেন।[১৪]

ব্রেখটের প্রথম দিককার কবিতাগুলোয় (জার্মানির অগ্‌সবার্গে থাকাকালীন লিখিত এবং 'গেরস্তালির সাতকাহন' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত) বিদ্রোহ আছে, আছে প্রেম ক্লেদজ, কোমল ও শরীরী। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে ব্রেখটের যে কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, তা বুর্জোয়া সমাজের অসঙ্গতি, মূল্যবোধ ও পাপের প্রতি নির্দেশিত। সমকালীন জার্মানকে তিনি দেখেছেন নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। এতে কোন মোহমুগ্ধতা নেই ; আছে ঘৃণাবোধ ও বিদ্রোহ।

'মারি' শিরোনামার দুটো কবিতার উদাহরণ নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দুটো কবিতার নারী চরিত্রকেই একই নামে ডেকেছেন ব্রেখট। কিন্তু 'স্মর্তব্য : মারিকে' কবিতায় যেখানে মারির বসন অদম্য প্রেমের স্মৃতিকে চাঙ্গা করে—

প্রথম স্পর্শ ছিল সেটি, ভালবাসা আমার
এতই পীত ও কোমল, মনে হল, 'সে' স্বপ্ন,
যাকে কোন মূল্যে দেয়া যাবে না বিবর্ণ হতে।
সেদিনও এমনই নীল মাস সেপ্টেম্বর
দীঘল বৃক্ষের শীর্ণ ছায়ার নিচে, নিশ্চুপ।
এবং সেই চুম্বনটি.... ।[১৫]

'শিশু হন্তারক মারি ফারার' কবিতাটি সেখানে আমাদের জন্য কথা বলে। বাস্তব এখানে নগ্ন এবং সত্য। ভাবালুতার অবকাশ শূন্য। বুর্জোয়া সমাজ জন্ম দিয়েছে এক পীড়নযন্ত্রের। তার শীৎকার নিষ্পেষিত মানুষের জীবনকে তিক্ত করে পুনরায়। ফলে ভোগে নারী ও তার গর্ভজাত অবৈধ শিশু। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেইক সাহসী মন্তব্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'পতিতালয়গুলোর গাঁথুনি গড়ে উঠেছে ধর্মের ইঁট দিয়ে।'[১৬] ব্রেখটের উপলব্ধির মাত্রাটিও একই গণ্ডিতে বাঁধা :

মারি ফারার : সন্তান জন্মের মাস, এপ্রিল

---

১৪. *Ibid*, p. 35-36

১৫. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০–১১

১৬. Blake, William, 'The Marriage of Heaven and Hell', in Abrams, M.H., Ed. *The Norton Anthology of English Literature*, W.W. Norton & Co., 1993, p. 57, স্ব-কৃত অনুবাদ।

মা নেই, বাবাবিহীন, হাড়জিরজিরে ; জন্মদাগ?
তাও নেই ; অতীতে
ভালো স্বভাবেরই ছিলো মেয়েটি, স্বীকার করলো নিজ হাতে,
খুন করেছে পেটের বাচ্চাটিকে।
এক দাই-মা'র কাছে গিয়েছিল মারি,
গর্ভধারণের দ্বিতীয় মাসে।
ওখানে দুটো ইনজেকশান,
ব্যথা হলো খুব, কিন্তু খালাস হলো না।
কিন্তু দু'হাত জোড় করছি আমি, তোমাদের কাছে।
তোমাদের সংযুক্ত ক্রোধকে প্রসারিত করো না,
এমন অসহায়া মেয়েটির প্রতি।[১৭]

এর পরের ঘটনা সহজ, অনুমেয়—'তারপর মারি ফারার। সরল মেয়েটি, সেই এপ্রিলেই, বসন্ত দিনে। অবিবাহিত মাতা, আইনের চোখে অপরাধী। তোমরা যারা পুত্র জন্ম দাও ধবধবে লিনেন শয্যায়, গর্ভধারণ পবিত্র বলে জানো ; এই মেয়েটিকে পাপিষ্ঠা বলবার রাখো না কোন অধিকার। মারির পাপের ওজন নেহায়েত কম ছিলো না, কিন্তু তার যন্ত্রণা ছিলো তার চেয়েও ব্যাপক, বিশাল।'[১৮]

এখানে গল্পকথনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ্যযোগ্য। স্বচ্ছ, যথাযথ এবং শক্তিশালী। শব্দ-ভারাক্রান্ত বর্ণনার আশ্রয় ব্রেখট কম নিয়েছেন, অথচ ভাবে ও প্রকাশে হয়েছেন তাৎপর্যবাহী। 'Less is more'—হেমিংওয়ের মতো ব্রেখটের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। স্বল্প আয়োজনের ব্রেখটের কবিতায় তাই অধিক মাত্রার সন্ধান মেলে। বিশেষত মারির গল্প এখানে তিনি যেভাবে বলেছেন তাতে থিয়েটারে ব্রেখটের অন্যতম অবদান দূরবর্তীকরণ প্রভাব বা Distancing Effect-র ধারণা সুস্পষ্ট।[১৯]

'গেরস্তালির সাতকাহন' গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায় নানা চিত্র এঁকেছেন কবি। প্রথাগত প্রতিবাদের চিত্র যেমন এখানে বিধৃত, প্রেম ও লিরিসিজমের মিলিত সমন্বয়ও এখানে প্রবহমান। সব মিলিয়ে এক যৌবনযুক্ত ব্রেখটের সন্ধান পাই আমরা।

---

১৭. Willet, J. & Manheim, R., *Poems 1913-1956*, p. 90-92, স্ব-কৃত অনুবাদ।
১৮. *Ibid*, p. 90-92
১৯. Williams, Linda R., Ed., *The Twentieth Century : From 1900 to the Present Day*, Bloomsbury, U.K., 1992, p. 94

পরবর্তীতে, বিশেযত ভবঘুরে জীবনে, পথে প্রবাসে সেই ব্রেখট অনেকাংশেই হারিয়ে গেছেন। সে হিসেবে অগস্‌বার্গের জীবন ব্রেখটের জীবনে দ্বিধামুক্ততার একটি স্বাক্ষর রচনার কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রচুর কবিতা এ সময় লেখা হয়েছে ব্রেখটের, পাশাপাশি চলেছে নাটকের কাজ। ব্রেখটের সে সময়কার বন্ধু হানস্ অটো মুন্‌স্টেরার The Young Brecht বইতে এ কার্যক্রমের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[২০] ব্রেখটের তরুণ কবি বয়সের যে চিত্র হানস্ এঁকেছেন, তা অমিত সম্ভাবনাময়।

এ পর্বের শেষ দিকের কবিতায়, বিশেষ করে 'বেচারা ব. ব. কে নিয়ে', ব্রেখটের পরবর্তী জীবন-অধ্যায়ের সূচনা ঘোষণা করে। অগস্‌বার্গের মফস্বল জীবন ছাড়িয়ে কবি শীঘ্রই পৌছাবেন বার্লিনে ; ধারণ করবেন সে নগরীর জটা-জটিলতা। তার আভাস এ বিখ্যাত কবিতায় সুস্পষ্ট :

আমি বের্টোল্ট ব্রখট, বেরিয়ে এসেছি কালো অরণ্য অঞ্চল থেকে,
মা নিয়ে এলেন আমাকে শহরে যে দিনটিতে,
শুয়ে ছিলাম আমি
তাঁর জরায়ু অভ্যন্তরে। সে কৃষ্ণ অরণ্যের হিম
রয়ে যাবে আমার মাঝে,
মৃত্যু দিন পর্যন্ত।[২১]

বার্লিনে এলেন কবি। বিস্তারিত শহর, বিপুল তার অবয়ব। কিন্তু এর ব্যাপকত্ব ব্রেখটকে অন্ধ করতে পারে নি। দ্রুতই তিনি এর আন্তঃজটিলতা এবং কঠিন অবয়ব-স্বরূপের সন্ধান পেলেন। এই অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে তাঁর *শহরবাসী পাঠককুলের জন্যে* (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ সাল অব্দি সুদীর্ঘ এগারোটি বছর বার্লিনে কাটিয়েছিলেন ব্রেখট। বার্লিনবাসের প্রথম দিনগুলোতে ব্রেখট ছিলেন উচ্চাভিলাষী যুবক-কবি এবং নাট্যকার। ফলত, শহরের লোকজন অবন্ধুভাবাপন্ন এবং জীবনযাত্রাশীতল। এর মধ্যে মানিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিলো না। ব্রেখট বলেছেন, বার্লিন এমনই নগর যেখানে পদচিহ্ন সযতনে মুছে রাখতে হয়, পাছে বন্ধুকুল বিরক্ত করে। শক্তিশালী ও বিষণ্ন এ কবিতায় হৃদয়হীন নগরসভ্যতার চিত্র দক্ষ হাতে এঁকেছেন কবি যেখানে নিজ পিতা ও জননীকে না চেনার ভান করাটাই প্রচলিত—প্রয়োজনীয় রীতিসাপেক্ষ :

কখনোই নয়, কখনোই নয়, তোমার মুখ তাদের দেখাবে না,

---

২০. Munsterer, Hans Otto, *The Young Brecht*, Libris, U.K., 1992

২১. Willet, J. & Manheim, R., *Poems,* p. 107-108, স্ব-কৃত অনুবাদ।

বরং

ঢেকে রাখো সব পদচিহ্ন।[২২]

অনেকে বলেন, বার্লিন নগরীর তিক্ত অভিজ্ঞতাই ব্রেখটকে আকৃষ্ট করে মার্ক্সিজমের প্রতি।[২৩] আধুনিক নগর সভ্যতার জঞ্জালে মার্ক্সীয় চিন্তা-প্রকৃতি কিছুটা অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছিলো। কবির এ সময়কার কবিতাগুলো তাই সমাজতন্ত্রকেই প্রচার করে এবং তুলে ধরে ধনতন্ত্রের অসারতা। যেমন, এ সময়কালে লিখিত 'এক রাতের শয্যা' শীর্ষক কবিতাটি :

ন্যুইয়র্কেও নাকি
প্রতি সন্ধ্যায়
২৬তম সড়ক এবং ব্রডওয়ের সংযোগস্থলে
একটি মানুষ
শীতের মাসগুলোতেও
হাত পাতেন পথচারীদের কাছে
এবং এ ভাবেই তিনি গৃহহীনদের জন্যে
আদায় করেন
রাতের একটি শয্যা।[২৪]

এখানে উল্লেখ্য, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা পর্যায় উদ্ঘাটন করেছেন ব্রেখট এ পর্বে লেখা নানা নাটকে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো *তিন পয়সার পালা* নাটকটি। পুরো সময়টি ব্রেখট দেখেছেন শোষণের কাল হিসেবে। ন্যুইয়র্ক সম্পর্কিত কবিতায়ও তিনি একটি কথাই স্পষ্ট করেছেন। এককভাবে আমরা খুব কমই করতে পারি, যদি না রাষ্ট্র তাতে ভূমিকা রাখে। আর তা ছাড়া এ তো সব সময়ই সত্য— আমরা কখনোই দাক্ষিণ্য দেখাবার সুযোগ পাবো না/যদি কাউকে গরিব না বানাই।[২৫] ব্রেখট সমাজের এই গরিব বানানোর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন এবং অকুণ্ঠ। আমরা লক্ষ্য করবো খুব শিগগিরই ব্রেখটের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় মার্ক্সিজম এবং

---

২২. *Ibid,* p. 131

২৩. Thomson, Peter, Ed., *Ibid,* p. 208

২৪. *Ibid,* p. 181

২৫. 'Pity would be no more
If we did not make somebody poor',
Blake, William, 'The Human Abstract', in Abrams, M.H., Ed. *The Norton Anthology of English Literature,* p. 39 স্ব-কৃত অনুবাদ।

এবং ফ্যাসিবাদ এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের প্রাত।

১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণের পর বার্লিন ছাড়তে বাধ্য হলেন ব্রেখট। এবার সুদীর্ঘ পনেরো বছরের জন্য। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড হয়ে '৪১–এ পৌছালেন আমেরিকায়। তারপর সেখানে ছ'বছর বাসের পর পুনরায় সুইজারল্যাণ্ড। অবশেষে ঘরে ফেরা তাঁর, তবে ১৯৪৮–এ। ব্রেখটের বয়স তখন পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়েছে।

প্রবাসে ব্রেখটের মধ্যে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়বার এক ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়কালে লিখিত ফ্যাসিবাদবিরোধী গদ্য ও নাটকের পাশাপাশি তিনি কবিতায় সময়ের প্রয়োজনে ভাবালুতা বিসর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে লিখিত 'শুধু ক্রমবর্ধমান অশান্তির কারণে' কবিতায় ব্রেখট বলেছেন, কবিতাকে হতে হবে ব্যাপক বাস্তবধর্মী। বাড়ির ছাদে পতিত তুষারের স্তর করা কিংবা নারীবক্ষ অথবা পক্ক আপেল—এ সব কবিতার বিষয়বস্তু হবার যোগ্যতা হারিয়েছে বহু দিন আগে। নিখাদ ব্যক্তিগত এবং শৈল্পিক আনন্দের জন্য সাহিত্য যেন আর ব্যবহৃত না হয়। কেননা, 'কবিতার জন্য এখন দুঃসময়'।

এ ভাবে যদিও ব্রেখট রাজনৈতিক কবিতার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং লিখেছেন প্রচুর, তবু অসঙ্গতি হলো, ব্রেখটের নন্দনতত্ত্ব বিজড়িত শিল্পী–সত্তা এর পরেও ছিলো চরম সজাগ। প্রবাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে, তৃতীয় রাইখের উত্থানের সমালোচনায় (উদাহরণ স্বরূপ : 'যে মানুষটি আজ হাসে/সে এখনও/ভয়াবহ সংবাদটি পায়নি।'), ব্যক্তিগত কাব্যভুবনে ব্রেখট নারীবক্ষ এবং পক্ক আপেল প্রস্ফুটনকে 'এই অন্ধকার সময়েও' বিষয়বস্তুর মর্যাদা দান করেছেন। ব্রেখটের রাজনৈতিক সত্তা এবং ব্যক্তিগত সত্তার দ্বন্দ্বমুখর রূপটি এখানে, কবিতায়, প্রকাশিত।

আমেরিকায় এলেন কবি ১৯৪১–এ। এখানেও আমরা দেখি কিভাবে প্রতিকূল ধনতান্ত্রিক শক্তি তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। প্রায় পঞ্চাশটি হলিউডি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেন নি একটিতেও। কবি অডেনের সঙ্গে কাজ করেছেন জ্যাকবিয়ান যুগের নাট্যকার জন ওয়েবস্টারের 'দ্যা ডাচেস অফ মালফি' নাটকের পুনঃরূপায়ণের কাজে, নিজস্ব আঙ্গিকে। কিন্তু সে নাটকও চলেনি। ঊনচল্লিশ রজনী শেষে মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রেক্ষাগৃহে। আমেরিকার মননের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন নি তিনি। ধননির্ভর সমাজও সমাজতন্ত্রী–পক্ষীয় ব্রেখটকে দেখেছে সন্দেহের চোখে, যার ফলাফল ছিলো আমেরিকা–বিরোধী কার্যকলাপের দোহাইয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কাঠগড়া পর্যন্ত পৌছান। ব্রেখটের জন্যে তা ছিলো

অপমানের, অস্বস্তির ও অনির্ভরতার চূড়ান্ত স্মারক। তার পরাদনই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লেন তিনি। ভয় ছিলো পাছে আমেরিকায় সারা জীবনের জন্যে গৃহবন্দী হয়ে পড়েন।

এতো কিছু ঋণাত্মকের মধ্যে কবিতাকেই বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ব্রেখট। নগরবাস সুখকর হয়নি তাঁর জন্য। তারুণ্যে যে কৃষ্ণ অরণ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, শহরের কংক্রিট প্রসারণে তার দেখা পাওয়া ভার। যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো তাই ব্রেখটের জন্য ছিলো প্রত্যাখ্যানের বস্তু। ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছেই প্রথম যে কবিতা লেখেন ব্রেখট, তার শিরোনাম 'নরকের কথা মনে পড়ে'। শতীর্থ শেলী'র কথা বলেছেন ব্রেখট যিনি Queen Mab গ্রন্থে লণ্ডনকে বলেছেন 'এমন এক শহর, যেন নরকের দোসর' (Hell is a city much like London)। লস্ এঞ্জেলসকেও তাই সঙ্গত কারণে কবি ব্রেখট দেবাত্মার শহর বলতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। হলিউডি শোকগাঁথা বা Hollywood Elegies–এ এ শহরকে তিনি City of Angels বলেন নি, বলেছেন, তিক্ততা ও ঘৃণার দেবদূত। ফ্যাসিবাদ ব্যতীত আরেকটি শোষক যন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এভাবেই ব্রেখট প্রকাশের ভঙ্গিতে এনেছেন, কাব্যে।

পূর্ব বার্লিনে ফিরলেন কবি, জীবনের শেষ ভাগে। সময়টা ১৯৪৯, অনেক কিছু অপেক্ষমান ছিলো সেখানে, তাঁর জন্যে। স্বীকৃতি, লেনিন শান্তি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হতে লাগলো তাঁর নাটক। কিন্তু এ সঙ্গে রাতারাতি ব্রেখট পরিণত হলেন রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে। সবচেয়ে প্রথাবিরোধী ছিলেন যিনি, যিনি বরাবর উপেক্ষা করেছেন, হেয় জেনেছেন অন্যায়ের প্রতি নীরব সম্মতি প্রদান, তিনিই নিজেকে দিলেন ব্যবহৃত হতে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবলেশহীন প্রচারযন্ত্রের এ জীবন ব্রেখট কিভাবে নিয়েছিলেন? বাইরে সভা-সমিতি করেছেন ঠিকই, টেনে রেখেছিলেন অবিচলতার মুখোশ। কিন্তু তাঁর আড়ালের মানুষটি বিক্ষত হয়েছে বিবেকের প্রশ্নে। সখ করে রাজকবি কখনও হতে চাননি ব্রেখট। কিন্তু যখন হলেনই, তাঁর মনের গোপন ভাষ্য, ক্রোধ ও আত্মধিক্কার ধরা পড়েছে কবিতায়। যেমন : 'নোংরা সকাল' ঃ

দেখলাম গত রাতের স্বপ্নে, কিছু আঙুল
নির্দেশ করছে আমাকে,
যেন এক কুষ্ঠরোগীর প্রতি।
কর্মে ক্লান্ত ওগুলো এবং
ভগ্ন।

তোমরা জানো না ! —চেঁচিয়ে উঠলাম আমি
বিবেকের কাছে পীড়িত।[২৬]

স্তালিনের পীড়কযন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ব্রেখট। প্রতারণা করেছেন গণমানুষের সঙ্গে। ব্রেখটের এ আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপ জানতে হলে আমাদের বার বার ফিরে আসতে হবে তাঁর কবিতার কাছে। আর কোন মাধ্যমে ব্রেখট এভাবে নিজেকে ধরা দেননি, যেভাবে দিয়েছেন কবিতায়।

এ শতকের গোড়ায় টি. এস. এলিয়ট নগরসভ্যতাকে দেখেছেন বিরানভূমি হিসেবে। সভ্যতার সঙ্কট অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও প্রগাঢ়ভাবে। এলিয়ট মুক্তি খুঁজতে চেয়েছেন ভারতীয় পুরাণে, আর ব্রেখট মার্ক্সীয় তত্ত্বে। এ ক্ষেত্রে সফলতা কতদূর এসেছিলো, কঠিন সে বিচার। তবে ব্যক্তিগত নানা মাত্রিক অভিঘাতের বিশ্বস্ত চিত্র এবং শিল্পরূপ হলো তাঁর কবিতা, সভ্যতার সঙ্কটকে যা ধারণ করে আছে পূর্ণ অবয়বে। সে ক্ষেত্রে কবিতা আর ধনুকের দ্বিতীয় গুণ থাকেনি, হয়ে উঠেছে ব্রেখটীয় একান্ত সত্তার একটি অপরিহার্য খণ্ড, যাকে বিচ্ছিন্ন করলে পুরো ভিতটাই ধসে পড়বে।

---

২৬. Willet & Manheim, *Poems*, p. 440, স্ব-কৃত অনুবাদ।